:: পঞ্চদশ অন্তর্জাল সংখ্যা ::

৯ই আষাঢ়, ১৪২৮/ 24.06.2021

-: সম্পাদক :-

সুনন্দা ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ	শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র
প্রভু নিত্যানন্দের অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
বঙ্গ সংস্কৃতিতে তাম্বুল	শ্রী দীপঙ্কর নন্দী
অসংশয়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website : https://www.parthasarathipatrika.com
Contact : 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

"পরম শ্রদ্ধার বিকাশ তখনই, যখন সমস্ত কিছুর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করব, প্রত্যক্ষ করব। যখন আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়ের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ সত্তার প্রকাশ, আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কর্মে, প্রকৃতির সকল সমগ্রতায় ঈশ্বরের উপলব্ধি – তখনই যোগ হয়ে ওঠে পূর্ণতম।"

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

সেদিন দীপু আমাকে হঠাৎ বলল – "তোর স্মৃতিচারণে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি, তুই আরও লেখ। ওঁর (শ্রীপ্রীতিকুমার) সম্বন্ধে আমাদের আরও জানতে ইচ্ছে করে। এত কাছে ছিলেন, এখন দুঃখ হয় কেন বারবার যাই নি। -- " দীপু আমার পিসতুতো বৌদি। ওর দুঃখের ভাগীদার আমিও। এমন একটি লোককে আমি বুঝতে পারিনি। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে পূজাপাঠ কিছুই করতে দিতেন না। বলতেন – "আমি যা করেছি তাতে আমার সাতপুরুষে আর কিছু করতে হবে না।" আমি গীতা পড়তে শিখিনি। ধ্যান করতে শিখিনি। আমি শিখেছি আব্দার করতে – দাবী জানাতে। এখন মনে হয় এত কাছের লোকটিকে এমন করে হারিয়ে ফেললাম! আবার দেখি তিনি হারান নি। আছেন আমার পাশে পাশে। আমাকে সামনে এগিয়ে যাবার সাহস যোগাচ্ছেন। আমি এই দেড় বছরে শুধু এগিয়ে গেছি। কোথাও পিছন ফিরে দেখিনি। যেটুকু পিছন পানে ফেরা, তা শুধু তাঁকে স্মরণ করবার জন্য।

শ্রীপ্রীতিকুমার ছিলেন আমার বড় বৌদির দাদা। আমার দাদার বিয়ের ঠিক আগেই তিনি পণ্ডিচেরী থেকে ফিরেছিলেন। তখনকার চেহারা দেখবার মত ছিল। সে যে কি রূপবান পুরুষ ছিলেন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যে না দেখেছে তার জন্য আমার এখন খুব দুঃখ হয়। অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ছিল। আমরা কোনও দিন তাঁর সামনে যাবার চেষ্টা করিনি। আমাদের বাড়িতে বৌদিকে দেখতে আসতেনও খুব কম। এলেও বাবার সাথে বা বৌদির সাথে একটি বা দুটি কথা। তারপর চলে যেতেন। দেখে মনে হত ভীষণ তেজী। আমি রীতিমত এড়িয়ে যেতাম।

আমার স্কুল ফাইনালের নম্বর তিনি বলে দিয়েছিলেন পরীক্ষা দেবার পরই। রেজাল্ট বেরবার পর সেই একই নম্বর কাগজে ও মার্কশীটে দেখে আমরা বিস্মিত হই। আমি বেথুন কলেজে ভর্তি হই। I.A. পরীক্ষার আগে আমি বৌদির সাথে মেদিনীপুরের পশং গ্রামে তার বাপের বাড়ীতে যাই পড়াশুনা করবার জন্য। মন্টুদার (প্রণব কুমার ঘোষ) ভাল ছাত্র হিসাবে সুনাম ছিল। মন্টুদা তখন পশং স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কথা ছিল তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াবেন। পশংয়ে থাকাকালীন শ্রীপ্রীতিকুমার এক রাতের জন্য সেখানে যান। তিনি রীতিমত খোঁজখবর করেন আমার খাওয়াদাওয়া ঠিকমত হচ্ছে কিনা, পড়াশুনা ঠিকমত করি কিনা। তখন শীতকাল ছিল। একটা তুষের চাদর দিয়ে আমাকে জড়িয়ে

দিলেন। এমন ভাব করলেন যেন তাঁর কাছে আমি শিশু। রাত্রে পাশে বসে খাওয়ালেন। কি কি আনলে আমার ভাল লাগবে, কি কি খেলে আমি খুশী হব মন্টুদাকে ও মাকে সেইরকম নির্দেশ দিলেন। আমি শৈশবে মাতৃহারা, বাপের আদুরে মেয়ে। কেউ আমাকে আদর করলে, ভাল করে কথা বললে আমি গলে জল হয়ে যেতাম।

পরদিন সকালে উঠে তিনি আমাকে পশং গ্রামটি দেখাতে নিয়ে গেলেন। আলপথ বেয়ে আনেক দূর হাঁটলেন। ওখানে ছেলেরা ব্যাডমিনটন খেলতো, তাদের সঙ্গে আমাকে খেলতে উৎসাহ দিলেন। তখন গ্রামে মেয়েরা ছেলেদের সাথে খেললে নিন্দা হোত। শ্রীপ্রীতিকুমার ওসব নিন্দাকে আমলই দিলেন না। তিনি আমাকে ঐ বদ্ধগ্রামে ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর মা অবশ্য এ প্রস্তাবে তখন সন্তুষ্ট হন নি। ভদ্রলোক ঐ একবেলাতেই আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। আমার মনে হয়েছিল ওঁর কাছে আমি কত ছোট। প্রকৃতপক্ষে ওঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি তাঁর কাছে শিশুর মতনই ছিলাম। তিনি আমাকে অবুঝ, অসহায়, আদুরে করেই রেখেছিলেন।

এখনও আমার সেই দিনটি চোখের সামনে ভাসে। পশং থেকে তিনি চলে যাচ্ছেন। বিকালে ট্রেন ধরতে হবে। পশং গ্রাম থেকে রাধামোহনপুর ষ্টেশনের দূরত্ব ছিল কমবেশি তিন মাইল। হাঁটা ছাড়া গতি ছিল না। যাবার প্রাক্কালে একগাল হেসে বিদায় নিলেন। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। একাই ফিরে চললেন কলকাতায়। একটি রাত থেকে দেখে গেলেন ছোট বোন আর তার ননদের গ্রামের পরিবেশ কেমন লাগছিলো। তিনি রওনা হবার পর আমার খুব খারাপ লেগেছিল। খুব কষ্টও হচ্ছিল। আমি বাড়ীর পিছনের মাঠে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম সোজা আলপথ দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে একটি কুকুর। সেই ছবিটা আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে এলো, কিন্তু আমার মনের মধ্যে খোদাই হয়ে গেল। কুকুরটা ফিরে আসাতে বুঝলাম তিনি ষ্টেশনে পৌঁছে গেছেন।

আমার দাদার বিয়ের সময় মেয়েদের অত বরযাত্রী যাবার প্রচলন ছিলনা। একমাত্র বোন হিসাবে বায়না ধরলে আমি যেতে পারতাম, কিন্তু কোনও কারণে আমি যেতে পারিনি। পরদিন আমি বাবার সাথে বৌদিকে আনতে গিয়েছিলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার সেই আমাকে প্রথম দেখেন। পরে তিনি বলেছিলেন আমাকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন আমি নাকি তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত মেয়ে। একথা আমাকে অনেক পরে বলেছিলেন। অন্ততঃ পশং গ্রামের সেই উপস্থিতিতে

আমি বুঝতে পারিনি। তিনি চলে যাবার পর আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক খুব দয়ালু স্নেহপরায়ণ এবং ভালো। আগেকার ধারণাটা বদলে গেছিলো।

I.A. পরীক্ষার সীট পড়েছিল বেথুন কলেজেই। পরীক্ষার 'হল' থেকে উঠে পালিয়ে আসা আমার অভ্যাস। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় বাবা ও ছোট জ্যাঠামশাই ডাঃ ব্রজলাল বসু রীতিমতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একবার করে পারছিনা বলে পালিয়ে আসি আর Christ Church School–এর তৎকালীন Asstt. Hd. Mistress Miss Mamen হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে বেঞ্চে বসিয়ে দেন। এইভাবে চলেছিল।

I.A. পরীক্ষার প্রথম দিনে টিফিনের একঘন্টা আগে বেরিয়ে দেখি শ্রীপ্রীতিকুমার দাঁড়িয়ে, বাবাও ছিলেন। হেদুয়ার এক কোণে গিয়ে বসলেন। কি যত্ন করে একটা একটা করে লেবুর আঁশ ছাড়িয়ে আমার হাতে দিলেন। তাঁর কাছে আসতেন রেখাদি। তাঁরও বেথুনে সীট পড়েছিল। রেখাদিকেও সযত্নে লেবু দিলেন। সেবারও বললেন- কোনও ভয় নেই, পাশ করে যাবে।

I.A. পরীক্ষা শেষ হোল। একদিন ফলও বেরোল। আমার ছোড়দাও আমার সাথে পরীক্ষা দিয়েছিলো। সেবার আমি সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করলাম। আমি হঠাৎ মামাবাড়ী শোনপুর চলে গেছিলাম। ওখানে থেকে শ্রীপ্রীতিকুমারকে চিঠি লিখেছিলাম আমি "সেন্ট পলস কলেজ" ছাড়া ভর্তি হব না। তিনি লিখেছিলেন, "আমার শ্বেতা কোথায় পড়বে সেটা আমি স্থির করব। এখানে পড়ব, ওখানে পড়ব না – এসব জেদ থাকা ভাল নয়।" আমি আর কিছু বলিনি। কলকাতায় ফিরে এসে দেখলাম আমাকে বেথুন কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। তখন বেথুন, ব্রেবোর্ণে ও ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে N.C.C. করা যেতো। বেথুনে I.A. পড়বার সময় আমার N.C.C. activity খুব ভালো ছিল। আমার Command-এ বেথুন কলেজ Drill-এ First position পেতে শুরু করেছিল। তাই বেথুনের ঊষাদি আমাকে বেথুনে ভর্তি হতে উৎসাহিত করেছিলেন।

ঐ B.A. পড়বার সময়েই আমার বিয়ে হয়ে যায়। শ্রীপ্রীতিকুমারের মাথায় লম্বা চুল ও মুখে দাড়ি ছিল। তিনি কোনও অবস্থাতেই চুল দাড়ি কাটতে রাজী ছিলেন না, তাই কলকাতায় বিয়ের অনুষ্ঠান করা যায়নি। আমাদের বিয়ে হয়েছিল গোবরডাঙ্গায়, আমার পিসীমার দেওরের বাড়িতে, যিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু।

সেই বিয়ের দিনের ঘটনাগুলি জানাতেও অনেক সময় লেগে যাবে।

গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে বর আনতে গাড়ী গেছিলো। দেখা গেল তিনজন ভদ্রলোক নেমেছেন চুলদাড়ি সহ। যারা আনতে গেছিলেন তারা স্থির করতে পারেননি কে প্রকৃত বর।

ষ্টেশনে নেমেই তিন ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করেছিলেন গৈপুর গ্রামের দিকে। তাঁরা হেঁটেই বিবাহ বাসরে পৌঁছেছিলেন। বিয়ের আসরে সম্প্রদানকালে বর হঠাৎ নিখোঁজ। খোঁজ, খোঁজ – তিনি তখন কোন মাঠঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

যাইহোক, অতি কষ্টে সাত পাকে ঘোরা তো হোল। রাত্রে বাসর ঘর থেকে আমার হাত ধরে টেনে একদম বাইরে। ওখানে একটি ছোট নদী আছে, তার স্থানীয় নাম 'যমুনা', একেবারে সেই যমুনার ধারে। সারারাত সেখানে বসে রইলেন। ভোরের আগে এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার তখন খুব অবাক লেগেছিল। এখন লাগে না। এখন মনে হয় শিবের বিয়ে বোধহয় অমন না হলে হয় না। তাঁকে আমার সাক্ষাৎ শিবই মনে হয়। বারবার ভেবেছি কেন এমন মনে হয়! হয়ত আমি তাঁকে শিবরূপে কল্পনা করেছি, শিবরূপে পেতে চেয়েছি, তাই। তাঁর অনেক আচরণই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে। কিন্তু সারা জীবন তিনি সেই শিবত্ব বজায় রেখেছেন। **

**(রচনাকাল- মে, ১৯৮৮)

"একমাত্র সেই কর্মই অধ্যাত্ম পরিশুদ্ধি আনয়ন করিতে পারে যাহা কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় না- যাহা যশ, লোক-প্রশংসা বা সাংসারিক মহত্ত্বের বাসনা লইয়া করা হয় না। যাহা আপন মানসিক কোন অভিপ্রায় বা প্রাণের কামনা বা দাবি বা দৈহিক অভিরুচির উপর জোর দিয়া করা হয় না। যাহা মিথ্যা গর্ব বা রূঢ় আত্ম প্রতিষ্ঠা অথবা পদ ও মর্য্যাদার দাবি লইয়া করা হয় না। পরন্তু একমাত্র ভগবানের জন্য এবং ভগবানেরই আদেশে করা হয়। অহঙ্কৃত ভাব লইয়া যে সমস্ত কাজ করা হয়, অজ্ঞানময় জগতের লোকের পক্ষে যতই কল্যাণকর হউক না কেন, যোগ সাধকের কোন উপকারেই তাহা আসে না।"

-- শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

পৃথিবীতে যখনই অন্যায়ের এবং অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখনই দেখা যায় এমন এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, যখন তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবধারা মানুষকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মাটিতে অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে এত সাধু, সন্ত, দরবেশ, ফকিরের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের আধ্যাত্মিকতা মানুষকে পরমতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছে, শান্তি দিয়েছে ও মনের মধ্যে চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

শ্রীঅরবিন্দ সেই রকমই এক যুগপুরুষ। তাঁর জীবনের পর্যালোচনা করে দেখতে পাওয়া যায় যে যদিও তিনি বাল্যকাল থেকে ইউরোপীয় আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি ভুলতে পারেন নি। ভারতের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। দেশকে এবং ভারতকে তথা সমগ্র বিশ্বচেতনাকে জাগ্রত করার জন্য তিনি যে সাধনা করে গেছেন, তা ক্রমশ প্রসারণের দিকে এগিয়ে চলেছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ভারতের সব মহাপুরুষদের সম্পর্কেই একথা বলা যায়, তবে এ-যুগে সাধন পদ্ধতির একটা নতুন দিগন্ত তিনি উন্মোচিত করে দিয়ে গেছেন। পথ একই – পদ্ধতি ভিন্ন। সকল মহাপুরুষের মধ্যেই পথ আবিষ্কারের উপায় স্বতন্ত্র থাকতে পারে। ভারতের আধ্যাত্মিকতাবাদের মধ্যে স্বাধীন পথকে সঙ্কুচিত করার কোন প্রচেষ্টা কোন মহাপুরুষই করেন নি – এইখানেই ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার বৈশিষ্ট্য।

আমি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যেটুকু ব্যক্তিগতভাবে ভেবেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে স্রষ্টা ভারতের কল্যাণের জন্যই তাঁকে বোধহয় এখানে প্রেরণ করেছিলেন – ভিন্ন পরিবেশে থেকেও তিনি ভারতীয় পরিবেশকে ত্যাগ করতে পারেন নি যৌবন থেকে।

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় অধিকাংশ ভারতীয়, ইংরেজের সান্নিধ্যে থেকে, তাদের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে, ইংরেজ বনবার প্রচেষ্টাই করতেন। সেকালের পদস্থ লোকদের জীবনের একমাত্র

কাম্য ছিল পুরোদস্তুর সাহেব বনা। শ্রীঅরবিন্দের পিতাও চেয়েছিলেন যে ডাঃ কে.ডি. ঘোষের পুত্রেরাও যেন ইংরাজী শিক্ষার ও সংস্কৃতির সমস্ত ভাবধারার অনুবর্তন করে। তিনি তাদের মানুষও করেছিলেন সেইভাবে।

শ্রীঅরবিন্দের শৈশবে শিক্ষা শুরু হ'ল দার্জিলিং সেন্ট পলস স্কুলে। সাত বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষার জন্য পাঠান হ'ল ইংলণ্ডে। ১৮৯০ খৃ অব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিলেন – তাতে গ্রীক ভাষায় প্রথম হয়েছিলেন কিন্তু অশ্বারোহণ বিদ্যা আয়ত্ব না করতে পারায় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার পান নি।

তারপর কেম্ব্রিজে বৃত্তি লাভ করে কিংস কলেজ থেকে ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

১৮৯২ সালে বরদার মহারাজার সঙ্গে বিলেতে পরিচয় হ'তে তিনি তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর রাজ-দপ্তরে একটি বিশেষ পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে তখন তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তিনি রাজকীয় ফর্মূলায় চলতে অভ্যস্ত হলেন না। সে কার্য পরিত্যাগ করে বরদা কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপাল হয়ে চলে গেলেন।

জ্ঞান অর্জন করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না – তিনি তাঁর দেশের কথা ভাবতে লাগলেন। উচ্চপদ, সম্মান কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাতেই তিনি চলে এলেন বাংলায়। এখানে গড়লেন ন্যাশানাল কলেজ, তারই অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করলেন তিনি। বরদায় তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করলেন সেই প্রথম।

রাজা সুবোধ মল্লিক যখন ইংরিজি পত্রিকা বন্দেমাতরম প্রকাশ করলেন, তিনি হলেন তার একজন ডিরেক্টর। বন্দেমাতরম পত্রিকায় সে সময় যে সমস্ত নিবন্ধ প্রকাশ হতে লাগল, তাতে ইংরেজরাও ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল ও শ্রীঅরবিন্দই যে পত্রিকার আসল কর্ণধার সেটুকু তাদের বুঝতে বাকি রইল না। সমগ্র ভারতে তখন তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে বুঝল, তিনি শুধু একজন চিন্তাশীল লেখক নন, তিনি একজন স্বদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

১৯০৭ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের এক সভায় যোগদান করেন এবং তারপর সুরাটে কংগ্রেসের প্রধান অধিবেশনে যান – কিন্তু সাম্প্রদায়িক অন্তর্বিরোধে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায়। সেই সময় তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের বহুস্থানে তেজস্বিনী ভাষায় পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্তি প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য ডাক দেন।

DO NOT COPY

১৯০৮ সালে, তিনি তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দেবে কি না দেবে তার জন্য অপেক্ষা করলেন না – স্বয়ং তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্র ঘোষ ও আরও কয়েকজনকে সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে বললেন। সশস্ত্র বিদেশীদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব করবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন – কিন্তু সে যুগে রাষ্ট্রচেতনা আজকের দিনের মত ছিল না, সুবিধাও ছিল না, তাই বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বিপ্লবীদের চরিত্র গঠন ও অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসের ভিত্তিকে তিনি দৃঢ় করেছিলেন সর্বপ্রথম। তিনি বলতেন, আত্মত্যাগ তারাই করতে পারে, যারা চরিত্রবলে দৃঢ় হয়। অন্যায় না করে, নিরীহকে হত্যা না করে। কিন্তু বিদেশীরা এমনি প্রতিবাদে কর্ণপাত করবে না, তাদের বাধ্য করতে হবে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়।

শ্রীঅরবিন্দ তখন বিপ্লববাদে বিশ্বাসী হলেও নিজে অস্ত্র ধারণ করেন নি। সেই সময় থেকেই তাঁর মনে ধীরে ধীরে এক অধ্যাত্ম-চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

ইংরেজ তাঁকে ষড়যন্ত্রকারী বলে ধরেছিল সত্য কিন্তু তাঁকে ফাঁসী দিতে পারেনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন হাইকোর্টের একজন প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার। তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ ভক্ত। তিনিই তাঁকে মুক্ত করে আনলেন ইংরেজের আদালত থেকে। সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে আদালত তাঁকে খালাস দিলেন।

পূর্বেই বলেছি, তখন থেকে তিনি এক অদৃশ্য সঙ্কেত পাচ্ছিলেন ঊর্দ্ধ থেকে। যদিও দার্শনিক পত্রিকা, আর্য পত্রিকা সম্পাদনা করা ও নানা তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক রচনায় তিনি তখন ব্রতী ছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ সে পথ থেকেও সরে এসে, এলেন পণ্ডিচারীতে তাঁর এক নিভৃত আশ্রমে। আরম্ভ হল সাধনা – সেই সাধনা থেকে বাইরের আর কোন ডাক তাঁকে স্পর্শ করল না। যোগীর মত মৌন, নির্বাক, ধ্যানস্থ হয়ে তিনি পরম সত্যের তপস্যায় ব্রতী হলেন।

তখন তাঁর চিন্তা শুধু একটি দেশে আবদ্ধ রইল না। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে, মহাচেতনার আবির্ভাব কামনায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। যে কার্য শুরু হয়েছে – একদিন না একদিন সমগ্র জগৎ সেই শুভচেতনার স্পর্শ পেয়ে সারা জগতে শান্তি, মৈত্রী, মানবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করবে একথা তিনি বলে গেছেন।

সমগ্র মানব জাতির জন্য যাঁর এই আদর্শ এবং স্বয়ং যে আদর্শকে উপলব্ধি করে, অপরদের এই পথে উদ্বুদ্ধ হবার মন্ত্র দান করে গেছেন, তিনি শুধু আমাদের নয়, ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রণম্য।

প্রভু নিত্যানন্দের অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

প্রেম ভিখারী নিত্যানন্দ নদীয়ার পথে পথে কীর্তন গেয়ে বেড়ান এবং ভগবদ্ প্রেমের অলৌকিক মাহাত্ম প্রচার করেন। তাঁর অনুরাগী নবদ্বীপবাসীরা তাঁকে ঘিরে নর্তন-কীর্তন করতে থাকে। নিতাইকে কাছে পেলে সারা নবদ্বীপবাসী যেন পাগলের মত হয়ে যায়। নিতাই হচ্ছেন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম লীলাপার্ষদ।

সেদিন নিতাই কীর্তন-টহল হতে ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন প্রিয়তম সুহৃদ হরিদাস। দু'জনের কীর্তন-টহল সারা নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখর করে রাখে।

এমন সময় নিতাই দেখলেন, জগাই ও মাধাই নামে দু'জন প্রাণোন্মত্ত যুবক নবদ্বীপের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাধাই নিতাইকে দেখা মাত্র ক্রুদ্ধ সাপের মত গর্জে উঠলো। সে হরিনাম শুনতে ভালবাসে না। হরিনাম হচ্ছে তার কাছে দু'চোখের বালাই।

নিতাই ও হরিদাস দু'জনে কীর্তন গেয়ে এগিয়ে চলেছেন।

মাধাইয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। মাধাই আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিরক্তি ভরে একটা কলসীর কানা তুলে নিয়ে মারলে নিতাইয়ের কপাল লক্ষ্য করে।

কলসীর কানা লেগে নিতাইয়ের কপাল কেটে দর দর ধারায় রক্ত পড়তে লাগলো।

পথচারীরা তাই লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু নিতাই একেবারে নির্বিকার। তার মুখে প্রতিশোধের উষ্মা নেই।

DO NOT COPY

জগাই কিন্তু মাধাইয়ের মত নয়। তার মনে দুঃখ এলো মাধাইয়ের এই নৃশংস ব্যবহার দেখে।

মাধাই আবার মারতে গেল নিতাইকে। এবার জগাই তাকে নিষেধ করলে। বললে, ছি! ওঁকে মেরো না। উনি হচ্ছেন বিদেশী সন্ন্যাসী। ওঁর কোন দোষ নেই।

ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছে গেছে মাধাইয়ের কথা।

মাধাই যে নিতাইকে মেরেছে সেই দুঃসংবাদ শুনে মহাপ্রভু ছুটে এলেন তাঁর প্রিয়তম লীলাপার্ষদকে দেখতে।

মহাপ্রভু এসে দেখলেন, নিতাইয়ের কপাল হতে দর দর ধারায় রক্ত ঝরছে।

তাই লক্ষ্য করে তাঁর কেমন দু:খ হলো। সেই সঙ্গে রাগও হলো। তিনি ক্রোধে হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর বললেন, ওরে পাপিষ্ঠ, আজ তোকে চরম দণ্ড দেবো।

মহাপ্রভুকে শান্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন নিতাই। করুণা বিগলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, প্রভু, ক্ষান্ত হও। মাধাই দোষ করতে পারে কিন্তু জগাই তো নিরপরাধ। আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে জগাইয়ের জন্যে। সত্যি বলছি প্রভু, এই আঘাতে আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। দয়া করে তুমি আমাকে জগাই আর মাধাইকে ভিক্ষে দাও।

নিতাইয়ের এমন কথা শুনে মুগ্ধ হলেন মহাপ্রভু। জগাইয়ের প্রতি তিনি তৃপ্ত হলেন। কারণ সে তাঁর প্রিয়তম লীলাপার্ষদের জীবন রক্ষা করেছে। তাই মহাপ্রভু জগাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন, জগাই, তুমি আমার প্রিয়তম লীলাপার্ষদের জীবন রক্ষা করেছ। এই কারণে তুমি আমার প্রিয়পাত্র হলে। আশীর্বাদ করি তোমার ওপর অচিরে কৃষ্ণকৃপা বর্ষিত হোক। তোমার ভক্তিলাভ হোক।

প্রভুর মহিমা অশেষ।

জগাই প্রভুর কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছে।

জগাইকে প্রভু আদর করেছেন দেখে মাধবের মনে তীব্র অনুশোচনা এলো। সে ভাবল, হায়, প্রভু আমাকে কেন ত্যাগ করলেন? আমি কি অপরাধ করলুম? জগাই তো আমার বন্ধু। সে প্রভুর কৃপা পেলো আর আমি পাবো না। এ কখনো হয়? এক যাত্রায় পৃথক ফল!

মাধাই মহাপ্রভুর পা দুটি জড়িয়ে ধরলে।

কিন্তু মহাপ্রভু তার ওপর বিন্দুমাত্র করুণা দেখালেন না। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মাধাইকে, মাধাই, তুমি যে অপরাধ করেছ তার সীমা-পরিসীমা নেই। পরম ভাগবত নিত্যানন্দ আমার লীলাপার্ষদ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়। তুমি সেই নিতাইয়ের শরীরে রক্তপাত ঘটিয়েছ। সুতরাং তোমাকে আমি কি ভাবে ক্ষমা করতে পারি? তুমি বরং নিতাইয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নাও।

গৌরাঙ্গ সুন্দরের কথামত মাধাই নিতাইয়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করলে।

নিতাই মাধাইয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলেন। এবার মহাপ্রভুর দৃষ্টি যাতে মাধাইয়ের ওপর পড়ে তার জন্যে তিনি সকাতর প্রার্থনা জানালেনঃ

কোন জন্মে থাকে যদি
আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইরে
শুনহ নিশ্চিত।।
মোরে যত অপরাধ
কিছু তার নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর
তোমার মাধাই।। (চৈঃ ভাঃ)

নিতাইয়ের প্রার্থনায় মুগ্ধ হলেন মহাপ্রভু। তিনি জগাইয়ের মত মাধাইকেও দিলেন গাঢ় প্রেমালিঙ্গন।

ধন্য হলো মাধাইয়ের জীবন। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাস্পর্শে রূপান্তর ঘটে গেল মাধাইয়ের।

মাধাই প্রথমে কৃপা পেলে নিতাই সুন্দরের।

এবার সে কৃপার অধিকারী হলো গৌরাঙ্গ সুন্দরের।

দুই মহাত্মার পুণ্য প্রেমের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল পাপী-তাপী জগাই-মাধাইয়ের জীবন।

এদের উদ্ধার করতে এসেছেন নিতাই আর গৌরাঙ্গসুন্দর। গৌরাঙ্গদেবের মত নিত্যানন্দ অবধূতও কম অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না। মাধাইয়ের জীবনে অদ্ভূত রূপান্তরই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

DO NOT COPY

নিত্যানন্দের জীবনে অলৌকিক বিভূতির বুঝি শেষ নেই। একবার নিত্যানন্দ পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে কীর্তন করতে লাগলেন।

কীর্তন করতে করতে তিনি মহাভাবে উদ্দীপিত হলেন। প্রেম-প্রমত্ত অবধূত নিত্যানন্দ চারদিক হুঙ্কারে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন।

সকলে ভীত ও আনন্দিত হলো তাঁর অলৌকিক নৃত্য দেখে আর কীর্তন শুনে।

ভাবের ঘোরে নিত্যানন্দ ছুটলেন জগন্নাথ-বলরাম বিগ্রহকে আলিঙ্গন করতে।

মন্দির-প্রহরীরা চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিলে। কিন্তু তাঁকে ঠেকাতে পারলে না।

বেদীর ওপর ওঠে নিত্যানন্দ বলরাম-বিগ্রহ আলিঙ্গন করলেন। তার গলার মালা তুলে নিয়ে পরলেন নিজের গলায়। তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঐশ্বরীয় ভাব। তাঁর মুখের শ্রীও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত সুন্দর।

ভক্ত ও অনুগতদের জয়ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হয়ে উঠলো।

নবদ্বীপে হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে অবস্থান করছেন অবধূত নিত্যানন্দ।

হিরণ্য পণ্ডিতের বৈষয়িক অবস্থা আদৌ ভাল নয়। তিনি শুদ্ধসত্ব এবং ভক্তিমান। পরম আগ্রহে তিনি নিত্যানন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

নিজে নিষ্কিঞ্চণ বৈষ্ণব। তাহলেও সেই সময় তাঁর বাড়ীর দিকে ডাকাতদলের দৃষ্টি পড়লো। কারণ নিত্যানন্দের গলায় সোনার গহনা ছিল প্রচুর। ভক্তেরা তার হাতে ও পায়ে সোনার গহনা পরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে আদৌ হুঁস নেই নিত্যানন্দের, তিনি ভাবের ঘোরে আপন মনে কীর্তন গেয়ে চলেছেন।

নিত্যানন্দ নিজে না চাইলেও ভক্তরা তাকে সোনার গয়না উপহার দিচ্ছে।

ঐ গয়না নেবার লোভে ডাকাতরা ওঁত পেতে রইলো। এই ডাকাতদলের নেতা এক তরুণ ব্রাহ্মণ। নরহত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি কাজে সে রত।

একদিন রাতে সেই ডাকাত দল হিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের পেছন দিকে লুকিয়ে রইলো। তাদের উদ্দেশ্য, সুযোগ মত নিত্যানন্দকে মেরে তাঁর কাছ থেকে সোনার গয়না ও টাকা পয়সা লুট করবে।

DO NOT COPY

রাত তখন বেশী হয় নি। ডাকাতরা ভাবলে, গভীর রাতে তারা আক্রমণ করবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত ঘুমে সকলে অচেতন হয়ে পড়লো।

তাদের ঘুম সহজে ছাড়লো না। রাত শেষ হয়ে ভোর হলো। তখনো তারা ঘুমে অচেতন। পরে সুর্য্যোদয় হলে তারা জেগে উঠে যে যার আস্তানায় চলে গেল।

ডাকাতদের জেদ বেড়ে গেল।

আর একদিন তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হানা দেবার জন্যে তৈরী হলো।

হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীর কাছে এসে দেখে কারা যেন অস্ত্র ও লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে, তাই দেখে তারা ভীষণ ভয় পেলো। ডাকাতি করার দিকে আর মন রইলো না। তারা ফিরে গেল নিজেদের আস্তানায়।

তৃতীয়বার তারা রাত্রিবেলায় এলো হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে।

তারা হৈ চৈ করে পণ্ডিতের বাড়ীতে ঢুকতে যাবে এমন সময় তারা বোধ করলে, কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে তাদের দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাবার উপক্রম হলো।

তখন তারা পরস্পরে জড়াজড়ি ও হুড়োহুড়ি আরম্ভ করলে।

এর পর শুরু হলো প্রচন্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। ডাকাতরা মহা বিব্রত বোধ করলে।

পরে কোন রকমে নিজেদের সামলে নিয়ে হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

এই ক'দিন প্রত্যক্ষ করার পর ডাকাতদলের সর্দারের মনে নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে আর কোন সন্দেহ রইলো না। ভাবলে ইনি তো যে সে মানুষ নন। এঁর মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তির অপার উৎস। এঁর পেছনে লাগা উচিত হবে না। তিন দিন ধরে তিনবার যখন বাধা পেলুম তখন বুঝতে হবে এই মহাপুরুষের ক্ষমতা অসীম।

ডাকাতদলের সর্দার তখন দলবলসহ আত্মসমর্পণ করলে নিত্যানন্দের শ্রীচরণে।

গত তিন দিনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডাকাত সর্দার নিত্যানন্দের কাছে এসে জানালে, প্রভু আমি মহাপাষণ্ড। আপনার অলঙ্কারের লোভে পড়ে পণ্ডিতের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিলুম। আমার পাপের আর সীমা নেই। আপনি কৃপা করে এ অধমকে চরণে স্থান দিন।

DO NOT COPY

ডাকাত ব্রাহ্মণের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন নিত্যানন্দ। তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন ডান করে বললেন ধীর কণ্ঠে, বাবা, তোমায় ক্ষমা করবো না তো কাকে করবো? তুমি যে মহা ভাগ্যবান। কৃষ্ণকৃপার ফলে তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশ এই ক'দিনে এমনভাবে দেখতে পেলে। এ জিনিষ ক'জন দেখতে পায়? তোমার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা হয়েছে। তুমি এবার দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন পরিত্যাগ করে ধর্মপথ অবলম্বন করো। তোমার অনুগামীদেরও সেই পথে নিয়ে এসো।

এই প্রকার উপদেশ দেওয়ার পর অবধূত নিত্যানন্দ নিজের গলার মালা পরিয়ে দিলেন ডাকাত সর্দারের গলায়। পরে তাকে আবার প্রেমালিঙ্গন দান করলেন।

পরবর্তী জীবনে এই ব্রাহ্মণ যুবকটি একজন পরম ভাগবতে রূপান্তরিত হলো।

ॐ ॐ

বঙ্গ সংস্কৃতিতে তাম্বুল **শ্রী দীপঙ্কর নন্দী (বসুমতী)**

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে তাম্বুল ব্যবহার বহুল প্রচলিত। সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার পূজা-পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠানে তাম্বুল অপরিহার্য। বাঙ্গালীর জীবনে তাম্বুল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঙ্গালীর জীবনে তাম্বুল অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে।

সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি সহস্র বছরের অনুশীলনলব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এবং শিল্প সাহিত্য সভ্যতার চরমোৎকর্ষতা দেশের জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ সহস্র বছরের সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বিলাসব্যসন, ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ, শিক্ষাদীক্ষা ও বিদ্বজনের চিন্তা ভাবনা প্রভৃতি ইহজগতের সাধনাই সংস্কৃতি।

সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র যেমন সাহিত্যে ফুটে উঠে তেমনি সংস্কৃতির চিত্রটিও পুরোপুরি ভাবে প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। তাই আমরা দেখতে পাই সমাজ জীবনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেগুলির সুস্পষ্ট ছাপ

DO NOT COPY

প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের সাহিত্যে। সাহিত্যকে সংস্কৃতির দর্পণ বলা যায়। সংস্কৃতির দর্পণ এই সাহিত্যে যুগে যুগে তাম্বুল কিভাবে চিহ্নিত হয়েছে, সে বিষয়ে একটু অনুশীলন করা যাক।

শ্রীধাম নবদ্বীপে অদ্বৈতভবনে মহোৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সম্ভার সংগৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে 'গুয়া পান' ছিল অন্যতম।

"ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।।
নাজানি কতক নারিকেল গুয়া পান।"

--চৈতন্য ভাগবত -বৃন্দাবন দাস

কারণ প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পান ভোজনের পর মুখশুদ্ধি হিসাবে 'গুয়া পান' চর্বনের রীতি প্রচলিত আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে দেখতে পাই-

সকল ব্রাহ্মণে করায় ভোজন
সকলে দিলেন পান।

--শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন

হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর জনক রাজার গৃহে পরমানন্দে পানভোজন সমাপ্তে তাম্বুল চর্বন করে মুখ শুদ্ধি করেন।

ভোজন করেন রাম পরম হরিষে।
দধিদুগ্ধ দিল রাজা ভোজনাবশেষ।।
সুতুষ্ট হইয়া রাম করেন অচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করেন মুখের শোধন।।

--কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড

মহাভারতেও দেখতে পাই-

ইন্দ্র আজ্ঞা পেয়ে পরে নানা দ্রব্য উপহারে
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া পালঙ্কেতে বসাইয়া
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম সুতে।।

DO NOT COPY

ভক্ত কবি নরোত্তম দাস তাঁর পরমারাধ্য দেবতা শ্রী চৈতন্যদেবকে নানা উপচার সহ পান ভোজন করিয়ে তাম্বুল সেবন করিয়েছেন।

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীকুমার।।
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে।।
তাম্বুল সেবার পর পালঙ্কে শয়ন।
--নরোত্তম দাসের পদাবলী

অতি প্রাচীন কাল থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য তাম্বুল দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখতে পাই, হরি পূজার ষোড়শ উপচারের অন্যতম তাম্বুল। শুধু হরি পূজার উপচারেই নয়, অনেক দেব পূজার উপকরণ তাম্বুল।

ক্ষীর দধি সুনবনী কর্পূর তাম্বুল। চৈতন্য ভাগবত বৈষ্ণবের গৃহে "বস্ত্র মুদ্যা যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়াপান" দিয়া ব্যাস পূজার প্রথা ছিল। সন্তান জন্মের এক মাস পরে ষষ্ঠী পূজা হত। পূজার প্রসাদ আবালবণিতা সকলকে গুয়াপান সহ বিতরণ করার রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত।

খইকলা তৈল সিন্দুর গুয়া পান।

ভক্ত কবি নরোত্তম দাস তাঁর প্রিয় তাম্বুল তাঁর পরমারাধ্য দেবতা শ্রী রামকৃষ্ণের বদন কমলে তুলে দিয়েছেন।

কণক সম্পৃট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব দুহুক অধীর।
--নরোত্তম দাসের পদাবলী

অন্যত্র,

কণক সম্পট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব দোঁহার বদনে। --ঐ

তাম্বুল মঙ্গল সূচক; প্রত্যেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাম্বুলের প্রয়োজন হয়। তাম্বুল দিয়ে সমস্ত অমঙ্গল মুছে ফেলা হয়। এ প্রথা অতি প্রাচীন কালের। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ে রচিত রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে লিখিত আছে-

DO NOT COPY

পণ্ডিত বেদগান নিছিআ পেলেন পান
হুলুই পীড় এ ঘনে ঘন।

-শূন্যপুরাণ

কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতু স্বদেশ প্রত্যাগমন করলে পান দিয়ে সমস্ত অমঙ্গল মুছে ফেলা হয়।

শিরে দিয়া দুর্বাধান নিছিয়া ফেলিল পান
ফুল্লরা সহিত সবিনয়।

--বসুমতী সংস্করণ

অন্যত্র-

'পান নিছে পোলাইয়া'। -ঐ

কৃত্তিবাসী রামায়ণেও (উত্তর কাণ্ড) দেখতে পাই-

পায়ে দধি দিল শিরে দুর্বাধান
মাথায় নিছিশ্বা শত শত পান।।

বিবাহ বাঙালীর জীবনে একটি পবিত্র ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাম্বুলের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। শিব কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রী আচারের আয়োজন করতে বললে দুর্গার প্রত্যুত্তরে তাম্বুলের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হয়েছে।

হাসি বলে চণ্ডি আই তোমার মুখে লাজ নাই
কি বা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
আর চাবে তৈল সিন্দুর।

--বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ

ফুল্লরার বিবাহ উপলক্ষে অধিবাসের বর্ণনায় কবি মুকুন্দরাম তাম্বুলের উল্লেখ করেছেন-

তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটি ভরা গন্ধ চুয়া

-চণ্ডীকাব্য।

তিনশত বছর আগেকার বাসর ঘরেও তাম্বুলের বহুল ব্যবহার সু-প্রচলিত ছিল।

DO NOT COPY

কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বুল পরিয়া।
কোন সখী নল করে দিলেন তুলিয়া।। --ঐ

বিবাহ উপলক্ষে তাম্বুল সহ মালাচন্দন বিতরণও প্রাচীন কালের প্রথা। শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় বিবাহে নবদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কারুরই আহারের নিমন্ত্রণ ছিল না – নিমন্ত্রণ গুয়াপান গ্রহণের। সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে সমাগত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে মালাচন্দন ও গুয়াপান বিতরণ করা হয়- একবার নয়, তিনবার।

সবারে তাম্বুল মালা দেহ তিনবার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর যে ইচ্ছা যাহার ।।
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে।।
এ মত চন্দন মাল্য দিব্য গুয়াপান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান।।
--চৈতন্য ভাগবত, আদি

পান দেওয়া ও লওয়া কোন কর্মের নিয়োগ ও কর্ম গ্রহণের প্রতীক। এ প্রথা অতি প্রাচীন কালের; পদ্মপুরাণে পাতাল খন্ডে ১৫/১৭, ৫/৪ শ্লোকে কর্মনিয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ পান দেওয়া ও লওয়ার উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন কাব্যেও এর উল্লেখ স্মরণীয়। রাধা কৃষ্ণের মিলন সাধন করাতে এই কাজের অঙ্গীকার স্বরূপ বড়াই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু ফুল নিয়ে শ্রীরাধিকার নিকট গমন করে।

আম্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পান।
তাক লঁআ জাই আমি রাধিকার থান।। --শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

সর্প দংশনে লখাইয়ের মৃত্যু হয়েছে, তথাপি চাঁদ সওদাগর ধৈর্য্যে অটল, মনসাদেবীর পূজা করবেন না। তিনি বাজানিয়াকে ‘গুয়াপান’ দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে বললেন,

শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কাণী পরাণ থাকিতে।।

কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া।।
চান্দ বলে বাজানিয়া লও গুয়াপান।
ঝুলাইয়া বাও বাদ্য বিষয়ী মুড়ান।।
--বংশীদাসের "মনসামঙ্গল"

পান দেওয়া ও নেওয়া সৌহার্দের প্রতীক। কারুর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে-বন্ধুত্ব হলে পান আদান প্রদানের প্রথা অতি প্রাচীন কালের। এখনো আমরা পান খাবার সময়ে সঙ্গী বন্ধুটিকে এক খিলি পান দিয়ে তবে নিজে খাই। কবি মালাধর বসু তাঁর "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্যে লিখেছেন,

কেহ বলে রসিক সুজন বড় কান।
কর্পূর তাম্বুলে সমে জোগাইব পান।।

চাঁদ সওদাগর বিদেশে বানিজ্যে বহির্গত হলে লহনা ও খুল্লনা দুই সতীনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলে-

কর্পূর তাম্বুল লয়ে দুই সতীনে থাকে শুয়ে
একত্রে শয়ন দিবারাত্রী ।

অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় তাম্বুল অপরিহার্য্য। পান দিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার রীতি অতি প্রাচীন কালের। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত বানভট্টের 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্যে এই প্রথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। মধ্য যুগেও বাংলা দেশে এ প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। চাঁদ সওদাগর বানিজ্যে যাবেন; তাই চতুর্দশ ডিঙ্গা নির্মানের জন্য কুশাই মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠান। কুশাই মিস্ত্রী এলে 'গুয়াপান' দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বলেন-

চান্দ বলে কুশাই তাম্বুল খাও ধর।
যাইব পাঠানে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজবার।।
-মালদহের জগজ্জীবন কবির "মনসামঙ্গল"

বাঙ্গালী নাবিকেরা ডিঙ্গা বেয়ে যে সমস্ত বানিজ্য সম্ভার নিয়ে দেশ বিদেশে বানিজ্যে যেতেন, তার মধ্যে পান, গুবাক (সুপারি) ও নারিকেল ছিল প্রধান। বংশী দাসের "মনসামঙ্গল" পাঠে জানা যায়, বাঙ্গালী নাবিকেরা গুবাকের বদলে নিয়ে আসতেন মানিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ।

আগে আনি গুয়াপান, থুইলেক বিদ্যমান

মূল্য বঙ্গে কাঁড়ারী দুলাই।
এক একটি পানে মরকত দশগুনে
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই।।
-দ্বিজ বংশীদাসের "মনসামঙ্গল"

বিদেশ বিভূঁয়ে বাঙ্গালী নাবিকদের তাম্বুল চর্বনই ছিল একমাত্র বিলাস ব্যসনের উপকরণ। বাঙ্গালী নাবিকদের তাম্বুল রাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধর দেখে সিঙ্ঘলীগণ অনুমান করেন-

কোতোয়ালের মুখ দেখি বলে সর্ব লোকে।
অন্য ঠাঁই এড়ি তোমা মুখ ধরে জোঁকে।।
--বিজয় গুপ্তের "পদ্মপুরাণ"

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ উপলক্ষে পান পাঠানো অতি প্রাচীনকালের প্রথা। শ্রীরাধাকে নিমন্ত্রণ করে আনার জন্য যশোদা সখীদের বললেন, রাধার বাড়ী যাও, তার গুরুজনদের বলে তাকে নিয়ে এসো। এই বলে সখীদের হাতে রত্নস্থলী ভরে বিবিধ মিঠাই ও পান পাঠালেন।

বিবিধ মিঠাই, ক্ষীর দধি শাকর পিষ্টক বড়ই মধুর
কর্পূর তাম্বুল হার, মনোহর বাসিত চন্দন কটোর।।
--গোবিন্দ দাসের "একাল্পবাদ"

প্রেম প্রণয়ের কামাচার সূচক আমন্ত্রণ উপলক্ষে তাম্বুল প্রেরণের রীতি প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ প্রথা অতি প্রাচীন কালের। বাৎস্যায়ণের কামসূত্রে এ প্রথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। এই বহুল প্রচলিত প্রথার উল্লেখ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও দেখা যায়। শ্রীরাধার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগের নিদর্শন-স্বরূপ দূতীর দ্বারা শ্রীরাধার নিকট তাম্বুল প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুল প্রেরণের বর্ণনা করেছেন এইভাবে –

তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী ।
বকুল তলাত আছে সে সুন্দরী মতী।।
চম্পা নাগের আর নেআলী মহলী।
ফুলে তাম্বুলে তারি লআঁ যাহা ডালী।।
ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বূল।

তবসি কহিহ সব কথা আদি মূল।
যোড় হাথ করী তাক বুলিহ বচন।
আম্মাকে পাঠায়েলি রাধার নন্দের নন্দন।।
কর্পূর বাসিত রাধা খাও তাম্বুল।
কাহ্নাঞির বচনে তোহ্মে দেহ অনুকূল ।।
-শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন "তাম্বুল খন্ড"

অন্যত্র

পুনরাপি যাহা প্রাণের বাড়াআঁ
তাম্বুলে ভরাআঁ ডালি
মিনতি করি আঁ হাথেতে ধরি আঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী।।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে

এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম
অতুল তাম্বুল হার।
--বসুমতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০২

আবার চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দেখতে পাই শ্রীরাধা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করে বলছেন, হে প্রিয়তম, একবার দেহের (চক্ষের) দেখা দিয়ে প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই তাম্বুল নিয়ে যাও।

হের দেখা নিয়া লহ না আসিয়া
এতন তাম্বুল লয়। -- বসুমতী সংস্করণ

চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও দেখতে পাই, শ্রীরাধিকার নিকট তাম্বুল প্রেরণ করে শ্রীকৃষ্ণ এই ইঙ্গিত করেছেন যে আমার প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।

তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল
ধায় নাহি রাইক আগে।

নারীর অধর ওষ্ঠ তাম্বুল রাগে রঞ্জিত না হলে নারীর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না- বাড়েও না। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যে লিখেছেন,

'কর্পূর তাম্বুল বিনা রসহীন মুখ'

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন,

DO NOT COPY

"পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উঠে মাছি।"

প্রাচীন কাল থেকে প্রসাধনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে অর্থাৎ নায়ক নায়িকার অধর রঞ্জনে তাম্বুল চর্বনের রীতি প্রচলিত আছে। শুক্রনীতিসার গ্রন্থে বর্ণিত চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম তাম্বুল রক্ষা। তন্ত্রসারে চৌষষ্টি উপচারের যে বর্ণনা আছে, তাতেও সেকালের প্রসাধনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে তাম্বুলের উল্লেখ আছে। সাজসজ্জার পর প্রসাধনের শেষে মুখবাসযুক্ত তাম্বুল গ্রহণের রীতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। কবি কালিদাসও এ প্রথার উল্লেখ করেছেন, তাঁর একাধিক কাব্যনাটকে।

পদকর্তা চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনায় শ্রীরাধার অধরে তাম্বুল দিয়ে শ্রীরাধার সৌন্দর্যের বর্দ্ধন করেছেন।

গলায় মালা শোভিছে ভাল
তাম্বুল বদনে তার
চর্ব্বিত চর্ব্বনে পড়িছে বদনে
শোভিত পিন্ধনহার।। --বসুমতী সং

কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র ও তাঁর নায়িকাকে এইভাবে চিত্রিত করেছেন,

কুমকুম চন্দন চূয়া বাটা ভরা পান গুয়া
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।

পদকর্তা জ্ঞানদাসও শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় শ্রীরাধিকার মুখে তাম্বুল দিয়ে শ্রীরাধার রূপ বর্দ্ধন করেছেন।

তাম্বুল অধরে মধুর বিম্বফলে
কিরদ দংশন কিবা দেল।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও "বাঙ্গালী মেয়ে"র সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন তাম্বুল সহযোগে-

"তাম্বুল তামাকুরস রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট।"

আবার শারদোৎসবে বাঙ্গালী কুল বধূদের নানাবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে তাম্বুল অধর ওষ্ঠ রঞ্জন করতে নির্দেশ করেছেন,

সুচিকন বারাণসী কটিতে বাঁধিয়ে অসি
রাঙ্গা কর অধর তাম্বুলে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনও বাঙ্গালী কুল বধূদের রূপ বর্ণনা করেছেন তাম্বুল রাগে–

অধরে তাম্বুল রাগ ললাটে সিন্দুর দাগ ।

বাংলাদেশে বিধবা রমণীদের মধ্যে সেই অধর রঞ্জক তাম্বুল চর্বন নিষিদ্ধ। কারণ তাম্বুল কাম উদ্দীপক। এই কারণে এ প্রথা অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হয়েছে বিধবা রমণীর পক্ষে তাম্বুল চর্বন গোমাংস তুল্য। (পৃঃ ৭৮) । কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালী বিধবা রমণীদের দুঃখ বেদনায় সমব্যাথীর মতই গেয়েছেন–

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ,
তাম্বুল কর্পূরে আর নাহিক সে বিলাস।

রমণীগণের মত সেকালে পুরুষগণের মধ্যে তাম্বুল চর্বন ছিল বিলাস ব্যাসন অর্থাৎ অধর রঞ্জনের অন্যতম উপকরণ। পদকর্তা চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের অধরে তাম্বুল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনা করেছেন,

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

অন্যত্র,

"বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।" --বসুমতী সং

শ্রীরাধা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় পদকর্তা বিদ্যাপতি শ্রীরাধার মুখ দিয়ে বলেছেন, হে মাধব, তোমার স্বরূপ কি? আমি তো জানি তুমি হাতের দর্পণ স্বরূপ, মাথার ফুল স্বরূপ, নয়নের অঞ্জন স্বরূপ, কিম্বা মুখের তাম্বুল স্বরূপ।

হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

কেবলমাত্র নারী পুরুষই নয়, সেকালে পার্বত্য নিবাসী শবর শবরী, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে তাম্বুল চর্বন করতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাপদাবলীতে পদকর্তা শবরপাদ শবর শবরীদের পার্বত্য জীবন বর্ণনায় বিলাস ব্যসনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে তাম্বুলের উল্লেখ করেছেন।

তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহামুখে সেজি ছাইলী,
সবরো ভূজঙ্গ নৈরামণি দাবী পেম্ম রাতি পোহাইলী।।
হিয়া তাঁবোলো মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কন্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোইল ।।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ডক্টর সুকুমার সেন এই পদের এইরূপ মর্মানুবাদ করেছেন, "ত্রিধাতুর" খাট পাড়িল শবর, শয্যা বিছানো হইল। প্রেমিক প্রেমিকা নৈরামণি প্রেমে রাত পোহাইল। হিয়া তাম্বুলে কর্পূর দিয়া মহাসুখে খাওয়া হইল, শূন্য নৈরামণিকে কন্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত পোহাইল।

গদাধর পন্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে চাটি গ্রামের পরম ভক্ত বৈষ্ণব পুন্ডরীক বিদ্যানিধির বিষ্ণু ভক্তির কথা শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, বিদ্যানিধি অতুলভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসে পান অর্থাৎ তাম্বুল চর্বন করছেন।

বড় ঝাড়ি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত,
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত।
দিব্য আলবাটী দুই শোভে দুই পাশে,
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে।
চৈতন্য ভাগবত -- বৃন্দাবন দাস

সেকালের ঝি চাকরেরাও তাম্বুল চর্বন করতেন। ধনপতি সওদাগর ভোজন করবেন, তাই তিনি বাড়ীর ঝি দুর্বলাকে হাটে পাঠালেন। বড়লোকের বাড়ীর চাকরাণী "হাতে পান মুখে গুয়া" হাটে যায়। কবি মুকুন্দরাম তাঁর এইরূপ বর্ণনা করেছেন,

কপালে চন্দন চূয়া হাতে পান মুখে গুয়া
পরিধানে তসরের শাড়ী।

শীতের দিনে তাম্বুল চর্বনে দেহ কিঞ্চিত তপ্ত হয়, শীত নিবারণে একটু সহায়তা করে বৈকি! প্রাচীন উদ্ভট শ্লোকে প্রকাশ-

তাম্বুল তপনং তৈলং তুলা তন্বী তনুনপাৎ।
হেমন্তে যে ন সেবন্তে তেরা বিধি বঞ্চিতা।।

DO NOT COPY

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর 'চন্ডিমঙ্গল' কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যায় ফুল্লরার মুখ দিয়ে এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন,

পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে তাম্বুল একাধিকবার একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। বাসক সজ্জায় তাম্বুল অপরিহার্য্য। প্রিয়তম মাধব শ্রীমতীর গৃহে আসবেন, শ্রীরাধা তাই শয্যা, মালা, চন্দন, কর্পূর, তাম্বুল, শীতল বারি বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভারে গৃহ সজ্জিত করলেন, যাতে প্রিয়তমের দিন যাপনের কোনরূপ অসুবিধা কিম্বা বিঘ্ন না ঘটে। প্রিয়তমের আগমন উপলক্ষে এই গৃহ সজ্জাকে বৈষ্ণব সাহিত্যে 'বাসকসজ্জা' নামে পরিচিত। এই প্রথা অতি প্রাচীন কালের। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জলনীলমণি' কাব্যে বাসক সজ্জার লক্ষণ এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বষুঃ।
সজ্জীকরোতি গোহক্ষ যাসা বসক সজ্জিকা।।

ভক্ত আগর দাসের শিষ্য নাভাজী প্রণীত হিন্দী 'ভক্ত মাল' গ্রন্থের শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত অনুবাদে "বাসক সজ্জার" লক্ষণ এইরূপ কথিত হয়েছে–

প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহ শয্যা মালা তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি।।
চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ।।

পদকর্তা চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যের সঙ্গে তাম্বুল সাজিয়ে রেখেছেন।

বধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু
গাথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা।

চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসের শ্রীরাধিকা ও বাসকসজ্জা উপলক্ষে তাম্বুলের সজ্জা করেছেন।

তাম্বুল কর্পূর খপুরে পুন রাখয়ে

বাসিত বারি সমীপে।

কবি নরোত্তম দাসের শ্রীরাধিকা শুধুই তাম্বুল সাজিয়ে রাখেন নি; প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ গৃহে এলে–

কনক সম্পূট করি কর্পূর তাম্বুল পুরিত
যোগাইব বদন কমলে।

অন্যত্র,–

'অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুল'।

কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এলেন না; এত সাজসজ্জা এত আয়োজন, মনের কামনা বাসনা সবই ব্যর্থ হল। কৃষ্ণ বিরহে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে বলেছেন,–

অগৌর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
প্রিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যায়।।
তাম্বুল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়ে সুখে।।

নরোত্তম দাসের শ্রীরাধাও শ্যামবিরহে ক্ষেদোক্তি করে বলেছেন,–

কর্পূর তাম্বুল গুয়া খপুর পুরিত সই
প্রিয়া বিনা কার মুখে দিব।

প্রাণের বঁধুয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে চন্ডিদাসের শ্রীরাধিকার মুখে তাম্বুল বিরস লাগে–

তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয় যেন।

বিদ্যার বিরহ বর্ণনায় কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র ও বৈষ্ণবপদকর্ত্তার মতই ভাবাবেশে লিখেছেন,

কর্পূর তাম্বুল লাগে যেন শূল
গীত নাট ঝন ঝনা।।।

'শতেক বরষ পরে বঁধুয়া' যখন শ্রীরাধার গৃহে এলেন তখন রাধিকার আনন্দের সীমা থাকে না। উভয়ের মধ্যে তখন মিলন সংঘটিত হয়। এ মিলন তাম্বুল আদানপ্রদানের। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্যটি

DO NOT COPY

বড়ই হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর। বিদ্যাপতি কবি রাধাকৃষ্ণের তাম্বুল লীলা বর্ণনা করেছেন এই রূপ–

কর্পূর তাম্বুল আপনি চিবিয়া
মোর মুখে ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া
মুখে মুখ দিয়া লয়।।

পদকর্ত্তা শশীশেখরও রাধাকৃষ্ণের তাম্বুল লীলা বর্ণনা করেছেন–

কর্পূর সহিত খপুর পান।
খায় হাসে ভাসে রসের প্রাণ।।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতিক জীবনেই নয়, বাঙালীর আশা আকাঙ্ক্ষা, হর্ষবেদনা, কামনা বাসনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই তাম্বুল। তাম্বুল বাঙালীর জীবনে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে বিরাজমান। বাঙালীর জীবনে তাম্বুলের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

অসংশয় **সুনন্দন ঘোষ**

চারিদিকে কান্না ক্রোধ প্রতিহিংসা –
কোথায় যে তোমাকে রাখি!
নাড়ীর বন্ধনে নয়, নারীত্বের অগ্নিময়তায়
তুমি প্রেম, তুমি অহংকার।
প্রতিদিন ফোঁটায় ফোঁটায় জমা হয় কঠোর যন্ত্রণা
এই বুকে –
হৃদয় খোঁজেনা কেউ!
সকলেই কাড়াকাড়ি করে দখল – দখল নিয়ে।

এ এক বিস্ময় দেশ।

DO NOT COPY

পদ্মা ভাগীরথী কুলে যুগে যুগে পণ্ডিতেরা
জ্বালিয়েছে রমণীর দেহ – শাস্ত্রের আগুনে।
নীতিশাস্ত্র কালনাগিনীর মত শুয়ে থাকে
পুরুষ নারীর মাঝে।
একই তুলাদণ্ডে সওদা হয় বুভুক্ষা ও প্রেম।

এ এক বিপন্ন কাল।
ধুলোয় ধোঁয়ায় কবে বিদায় না নিয়ে চলে গেছে বসন্ত শরৎ;
ঋতুচক্রে এখন কেবল গ্রীষ্ম বর্ষা শীত।
জীবনানন্দ-হীন দাসত্বের দিনে
হেমন্তের শালিধান, কাশ, মরালেরা, চাল ধোয়া স্নিগ্ধ হাত,
ধানমাথা চুল ---- সব আজ যাদুঘরে মৃত্যুর ফসল।

রাত্রি তন্দ্রাহীন।
শয্যা ছেড়ে উঠে আসি।
তোমার চোখের জল জমা হয়
শব্দহীন হৃদয়ে আমার।
ধমনীর ক্ষীণ হয়ে আসা রক্তস্রোতে জমে ওঠা
সমস্ত শ্যাওলা সরিয়ে তোমার মুখের প্রতিকৃতি জেগে ওঠে।

কান্না আছে, ক্রোধ আছে,
সব বাধা ছিন্ন করে আমার চেতনায় আছো
শাশ্বতী নায়িকা –
অর্কহীনা
তুমি বাংলাদেশ।

DO NOT COPY